...পুড়ছে এখন বাংলাদেশ!

শওগাত আলী সাগর, কানাডা থেকে

শব্দটা সম্ভবত অস্বাভাবিক রকমের উচ্চস্বরেই বেরিয়ে গিয়েছিলো আমার কণ্ঠ থেকে। পাশের টেবিলের সহকর্মী সিয়েরালিওনের মেয়ে সোয়াদ এবং অন্য পাশে হায়দারাবাদের ছেলে প্রিয়ান একসঙ্গে চমকে ঘুরে তাকালেন। তাদের চোখে বিস্ময়মিশ্রিত প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ততক্ষণে খেয়াল হয়, এটা আমার কর্মস্থল, টেলিফোনের ওপাশে যিনি আছেন তিনি আমাদের গ্রাহক। একজন গ্রাহক অনেক কথাই বলতে পারেন, কিন্তু একজন সেলস পার্সনকে হতে হবে সংযম। তিনি কোনো প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ করতে পারবেন না। কিন্তু টেলিফানের ওপাশ থেকে ভদ্রমহিলার 'তুমি কি ইন্ডিয়ান?' -এই প্রশ্নটা কেন জানি খানিকটা পীড়া দেয়, আর সে কারণেই বোধ হয় 'না' শব্দটা একটু উঁচু স্বরে বেরিয়ে গিয়েছিলো।

আমার দুপাশের সহকর্মী খানিকটা হতচকিত দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকালেও টেলিফোনের ভদ্রমহিলা 'খিল খিল করে হেসে উঠলেন। জানতে চাইলেন, তোমার দেশ তাহলে কোথায়? জবাব দিলাম, 'বাংলাদেশ। তুমি সম্ভবত চিনবে না।' এবার আরো উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন তিনি। 'চিনবো না কেন! বাংলাদেশ তো বোমার দেশ, যেখানে মানুষ বোমার সঙ্গে বসবাস করে। পুরো দেশটি হচ্ছে একটি মৃত্যুকূপ, যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনা করে একটি নিষ্ক্রিয় সরকার। আমি 'ইম্পর্টেন্ট' শব্দটাই ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। পাছে তোমার ইমোশনে লাগে তাই 'নিষ্ক্রিয়' শব্দটাই ব্যবহার করলাম। তুমি যে কোনো একটি শব্দ ব্যবহার করতে পারো।'

'বাংলাদেশ সম্পর্কে তুমি কী এমন জানো?'- আমি কিছুটা বিরক্তি নিয়েই তাকে প্রশ্ন করি। তার জবাব, 'সেটি জরুরি নয়, জরুরি হচ্ছে আমি যেটা বললাম সেটি সত্য কি না? কয়েক মাস আগে তোমরা তোমাদের দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে বোমা মেরে খুন করার চেষ্টা করেছিলো। সেই ঘটনার কোনো বিচার হয়নি এখনো। এমনকি কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তাও তোমরা খুঁজে বের করতে চাওনি। যে দেশে সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা চেষ্টার কোনো বিচার হয় না, সে দেশের সরকারকে 'ইম্পর্টেন্ট' বলাটাই যুৎসই নয় কি? কারণ এ থেকে জনগণের নিরাপত্তার এটি পরিমাপ করা যায়।'

ঘটনাটি যখন ঘটেছে তখনো বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া গ্রেনেড হামলায় মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারাননি। রাতে কর্মস্থল থেকে ফেরার পর অ্যাপার্টমেন্টের এলিভেটর থেকে নেমে লবি ধরে হেঁটে হেঁটে ঘরের দিকে যেতে যেতে সেরিন যখন বললো, 'একটা দুঃসংবাদ আছে!' আমি খানিকটা চমকে উঠেছিলাম। 'কিবরিয়াকে মেরে ফেলা হয়েছে'– সেরিনের এই বাক্যটি শেষ হতে না হতেই কেন জানি আমার কানে সশব্দে সেদিনকার সেই মহিলার খিল খিল হাসি আর 'বাংলাদেশ! যেখানে মানুষ বোমার সঙ্গে বসবাস করে। পুরো দেশটি হচ্ছে একটি মৃত্যুকূপ, যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনা করে একটি নিষ্ক্রিয় সরকার।' কথা ক'টি বাজতে থাকে। আমি ফিস ফিস করে অচেনা সেই ভদ্রমহিলার উদ্দেশে উচ্চারণ করি, 'তুমি 'ইম্পর্টেন্ট' শব্দটাই ব্যবহার করতে পারো, এমনকি 'খুনি' শব্দটাও। এর চেয়েও খারাপ কোনো শব্দ যদি তুমি ব্যবহার করতে চাও, আমি আপত্তি করবো না। সত্যি সত্যি বাংলাদেশ নামের প্রিয় জন্মভূমিটি এখন হায়েনাদেরই হাতে নিয়ন্ত্রিত।'

২.

গভীর রাতে আমাদের বন্ধু ঋষিকেশ ফোন করে জানতে চান, 'বলতে পারেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি? কিবরিয়ার মতো লোক যদি বাংলাদেশে বাঁচতে না পারে, তাহলে ওই দেশে কে আর বেঁচে থাকবে?' সাবেক ছাত্রনেতা আনোয়ার হোসেন মুকুল

ফোন করলেন পরের দিন। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে ফোন করবে'- তার অনুযোগ। কিবরিয়ার মর্মান্তিক হত্যাকান্ডে তিনি এতোটাই মর্মাহত যে কাজ থেকে বেরিয়ে চলে এসেছেন। তার জিজ্ঞাসা, 'বাংলাদেশ থেকে কি আওয়ামী লীগকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে?' তার মন্তব্য, 'শাহ এ এম এস কিবরিয়ার হত্যাকান্ড তো কেবল একজন ব্যক্তি কিবরিয়ার হত্যাকান্ড নয়। আওয়ামী লীগের মতো একটি বড় দলের সঙ্গে দাতা গোষ্ঠীসহ আন্তর্জাতিক নানা শক্তির সঙ্গে সম্পর্ককে দুর্বল করে ফেলার জন্যই কি কিবরিয়াকে খুন করা হলো? এর পর কি তাহলে আবারও শেখ হাসিনার ওপর হামলা হবে?'

বস্তুত, আনোয়ার হোসেন মুকুলের এই প্রশ্নগুলোই এখন ঘুরেফিরে উচ্চারিত হচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশে। আর বরফে জমে যাওয়া এই টরন্টোতে বসেও একই জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে খুঁজতে টের পাই সাত সমুদ্র তের নদীর বিস্তর দূরত্ব ঘুচে গিয়ে কখন যেন টরন্টো আর বাংলাদেশ একাকার হয়ে গেছে। বাংলাদেশের হাজারো মানুষের মতোই বেদনা কাতর আর ভবিষ্যৎ ভাবনায় উদ্বেগাকুল হয়ে পড়েছে কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশীরাও।

তাদের মনেও একই প্রশ্ন জেগে ওঠে, গন্তব্যবিহীন এ কোন গন্তব্যে ছুটে চলেছে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। গণতন্ত্র, প্রগতিশীলতাকে নির্বাসিত করার যে প্রক্রিয়া বাংলাদেশে শুরু হয়েছে তার চূড়ান্ত পরিণতিই বা কী? স্থানীয় বাংলা কাগজের চেয়ারম্যান এ আর এম জাহাঙ্গীর যখন মন্তব্য করেন, 'আপনি হাসিনাকে যত্রতত্র কাঁদতে দেখেছেন, কর্মী নিহত হলে, নেতা নিহত হলে কিংবা কোনো রিকশাওয়ালা মারা গেলে শেখ হাসিনা হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন। কিন্তু খালেদা জিয়াকে কি কখনো কাঁদতে দেখেছেন? তার চোখে কি কখনো পানি দেখেছেন?' তখন আরেকটি প্রশ্ন জাগে, 'খালেদার চোখে তা হলে কি আগুন আছে? আর সেই আগুনেই কি পুড়ছে এখন বাংলাদেশ?'

৩.

'বাংলাদেশে এমন কোনো অপরাধ সংঘটিত হয় না যেটি পুলিশের অজানা। তবে পুলিশকে ক্ষমতাসীন সরকার যতদূর যেতে দেয়, পুলিশও ততদূরই যায়। রাজনৈতিক বিবেচনায় পুলিশ যতোটা গ্রিন সিগন্যাল পায় ততোটাই অপরাধের উন্মোচন করে, অপরাধীকে গ্রেপ্তারে ততোটাই অগ্রসর হয়। রাজনৈতিক 'রেড সিগন্যালের' কারণেই লোমহর্ষক বড় বড় অপরাধও সময়ের গর্ভে হারিয়ে যায় অনোন্মোচনীয় রহস্য হিসেবেই।' - এই কথাগুলো প্রায়ই বলতো এক পুলিশ বন্ধু।

পুলিশ বন্ধুটির বক্তব্যের সূত্র ধরেই আজকাল আমারও কেন জানি মনে হয়, বাংলাদেশে এমন কোনো রাজনৈতিক অপরাধ সংঘটিত হয়নি, যেটি সরকার জানে না। কোনো বোমা হামলারই রহস্য উন্মোচিত হয়নি সরকারের অনীহার কারণেই। সাংবাদিক মানিক সাহা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউনুস কিংবা আহসানউল্লাহ মাস্টার এমপি হত্যাকান্ড কেনোটিরই যৌক্তিক পরিণতি এখনো ঘটেনি বাংলাদেশে। ভবিষ্যতেও যে ঘটবে তার কোনো লক্ষণ এখন পর্যন্ত নেই। এমনকি সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টারও কোনো রহস্য উন্মোচন করেনি রাষ্ট্র। কিবরিয়া হত্যাকান্ডেরও যে একই পরিণতি হবে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশেরও কোনো যুক্তি আমি খুঁজে পাই না।

২১ আগস্টে শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলার পর বাংলাদেশের সংসদীয় দলের একটি প্রতিনিধিদল এসেছিলো কানাডা। সরকারদলীয় এক সাংসদ ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে এসেছিলেন স্থানীয় বাংলা সাপ্তাহিক 'বাংলা কাগজ' অফিসে। বাংলা কাগজের আমন্ত্রণে সেই সন্ধ্যায় আমিও সেখানে গিয়েছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিলো সরকারদলীয় একজন সাংসদের মুখ থেকে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানা। সেই আলোচনায় বাংলাদেশের রাজনীতি, মৌলবাদ, সন্ত্রাস ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে। সাংসদ সাহেবকে আগেভাগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো আলোচনাটি অনানুষ্ঠানিক, কাজেই তিনি খোলামেলা মন্তব্য করতে পারেন, এগুলো পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে না। খোলামেলা সেই আলোচনায় প্রশ্ন উঠেছিলো, শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলার ব্যাপারে সরকারের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি কি? আপনাদের সংসদীয় দলের সভায় কিংবা হাই কমান্ড থেকে এ ব্যাপারে কি ধরনের ব্রিফ দেওয়া হয়েছে? সাংসদ ভদ্রলোক চমৎকারভাবে বলে গেলেন, 'সরকার মনে করে এসবই বিরোধী দলের কাজ। সরকারকে অস্থিতিশীল করার জন্য বিরোধী দল নিজেরাই শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলা করেছে, আহসানউল্লাহ মাস্টারকে খুন করেছে।' আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, রাজনীতিক হিসেবে নয়, বিএনপি দলীয় সাংসদ হিসেবে নয়, একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে আপনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি কী এ ব্যাপারে? ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'দেখুন আমি একজন ব্যাক বেঞ্চার এমপি। আমাকে কেন এসব প্রশ্ন করে বিব্রত করেন?' সেই আলোচনায় আমি আর বসিনি। তৎক্ষণাৎ আলোচনা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

কিবরিয়া হত্যাকান্ডের খবর পাওয়ার পরপরই প্রথম মনে হয়েছে, সরকার এবারও এটিকে 'আওয়ামী লীগের কাজ' বলেই প্রচার চালাবে। আমার এই ধারণার প্রমাণ পেতে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। কিবরিয়া হত্যাকান্ডের এক বা দু'দিন পরই মৌলবাদী গোষ্ঠীর অর্থায়নে সদ্য প্রকাশিত একটি দৈনিকে এক চৈনিক বাম লেখক কিবরিয়া হত্যাকান্ডটিকে একটি চক্রান্তমূলক ঘটনা বলে উল্লেখ করে এটিকে বিরোধীদলীয় কাজ বলে ইঙ্গিত দিয়েছে।

৪.

কিবরিয়া হত্যাকান্ডের কোনো কিছুই হবে না? টরন্টোর নানাজনের এই প্রশ্নের জবাবে আমি বলেছি, 'না'। কিছুই হবে না। শেষ পর্যন্ত এটি রাজনীতির খেলায় পরিণত হবে, হবে নোংরামি। সেই নোংরামি সরকার যেমন করবে, করবে তার দল আওয়ামী লীগও। সেই খেলায় যোগ দেবে 'নিরপেক্ষ' হিসেবে বিবেচিত মিডিয়া, রাজনীতির বিশ্লেষকগণও।

এদেশে এমন কোনো রাজনৈতিক অপরাধ সংঘটিত হয়নি, যেটি সরকার জানে না। কোনো বোমা হামলারই রহস্য উন্মোচিত হয়নি সরকারের অনীহার কারণেই। সাংবাদিক মানিক সাহা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউনুস কিংবা আহসানউল্লাহ মাস্টার এমপি হত্যাকান্ড কেনোটিরই যৌক্তিক পরিণতি এখনো ঘটেনি

হবিগঞ্জের মাটিতে কিবরিয়ার রক্তের দাগ শুকানোর আগেই রাজনীতির নোংরা সেই খেলা শুরু হয়ে গেছে। এখন এই নোংরামি থেকে কেবলই পচা দুর্গন্ধ বেরুবে, পরিবেশকে আরো কলুষিত করবে।

কিবরিয়া হত্যার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ হরতাল ডেকেছে এই খবরটি পত্রিকায় পড়ে আমিই প্রশ্ন করেছিলাম, এতো তাড়াতাড়ি হরতাল ডাকতে হবে কেন? আনোয়ার হোসেন মুকুলের জবাব, খুনিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে না? তিন দিনের হরতালের পর আবার তিন দিন বাড়াতে হবে কেন?

টরন্টোর এক আড্ডায় আমাদের এক বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন, নব্বইয়ে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে একজন শ্রমজীবী নূর হোসেন কিংবা একজন পেশাজীবী ডা. মিলনের হত্যাকান্ডেই সারা জাতি এমন ফুঁসে উঠেছিলো যে, স্বৈরশাসককে গদি ছাড়তে হয়েছে। আর এখন জনপ্রতিনিধি, সাবেক মন্ত্রীর প্রাণহানিও জনগণকে তেমনভাবে উত্তেজিত করে তুলে না কেন? এমনকি খোদ বিরোধীদলীয় নেত্রীর প্রাণনাশের চেষ্টার পরও সরকার পতনের মতো আন্দোলন গড় উঠে না কেন?

এই প্রশ্নের নানা জবাব পাওয়া গেছে ওই আড্ডায়ই। 'গণআন্দোলন তো বছরে বছরে হয় না।' বলছিলেন একজন। আমাদের আরেক বন্ধু তার একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরেন আমাদের সামনে। 'বাংলাদেশে এখন রাজনীতিবিদ এবং জনগণের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক তৈরি হয়েছে। এই দূরত্ব তৈরির পেছনে রাজনীতিকদের ব্যর্থতা যেমন আছে, তেমনি অরাজনৈতিক শক্তির আজ্ঞাবহ একটি মুখোশধারী সুশীল সমাজের রাজনীতিবিরোধী প্রচারণাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। গত কয়েক বছর ধরেই দেখেছি প্রচারমাধ্যম, সভা-সেমিনারে বাংলাদেশের রাজনীতিকদের গালি দেওয়া, 'রাজনীতি কিংবা রাজনীতিবিদরাই সমাজ তথা দেশটিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে'-

এমন একটি প্রচারণা চালিয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক, বেসামরিক আমলারা সংবাদপত্রে কলাম লেখে রাজনীতিবিরোধী প্রচারণা চালিয়েছেন, কোনো কোনো প্রগতিশীল (?) পত্রিকাও রাজনীতিবিরোধী প্রচারণাকে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কোনো বিশ্লেষককে দেখেছি অর্থনীতির প্রাণস্পন্দন ধ্বংস করে দেওয়া ঋণখেলাপি, কালোবাজারিদের পয়সায় পাঁচতারা হোটেলে লাঞ্চ সেরে এসে রাজনীতিবিদদের কষে গালি দিয়ে বিশ্লেষণ লিখতে বসে গেছেন।

কিন্তু রাজনীতিবিদরাও জনগণের আস্থাটাকে ধরে রাখতে পারেননি। জনগণও এখন বুঝে গেছে, আন্দোলন-সংগ্রামে দেওয়া তাদের রক্ত কিংবা প্রাণ আখেরে দেশ বা জাতির কোনো উপকারে লাগে না, উপকারে লাগে বিশেষ একটি মহলের। তাই মহল বিশেষের উপকার করতে জনগণ এখন আর নিজের প্রাণ বিসর্জন বা রক্ত দেওয়াকে খুব একটা বীরত্বের কাজ মনে করে না।

দুর্ভাগ্য হচ্ছে, শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলা করে তার প্রাণনাশের চেষ্টা কিংবা কিবরিয়া হত্যাকান্ড এই দুটো ব্যাপারেই আওয়ামী লীগও একটু বেশি রাজনীতি করে ফেলেছে। কিবরিয়া হত্যাকান্ডের পরপরই শেখ হাসিনা যখন বলেন, 'মা বেটা খুনি, তাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে হবে।' ঠিক তখনই জনগণ একটু থমকে যায়। 'মা বেটা খুনি, ওদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে হবে'- এমন বক্তব্যের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জনগণ রাজনীতি খুঁজে পায়, তাদের মনে হতে থাকে খালেদা ক্ষমতা থেকে সরে গেলে ক্ষমতায় আসবেন হাসিনা। হাসিনা এলেই কি সব সমস্যার সমাধান? ক্ষমতা বদলের রাজনীতিতে জনগণ সম্ভবত নতুন করে ব্যবহৃত হতে খানিকটা দ্বিধাবোধ করেন।

কিবরিয়া হত্যাকান্ডটি খালেদা নিজে কিংবা তারেক জিয়া নিজের হাতে করেছেন এটি সম্ভবত কোনো পাগলও বিশ্বাস করবে না। কিন্তু হত্যাকান্ডের পর এটি হালকা করে ফেলার প্রচেষ্টা, রাজনৈতিক বিতর্কের আড়ালে ফেলে দিয়ে খুনিদের আড়াল করার অপচেষ্টা, সর্বোপরি খুনিদের গ্রেপ্তার কিংবা শাস্তি দেয়ার উদ্যোগ না নেয়ার মধ্যেই কিন্তু সরকারের খুনিদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সরকারের ভূমিকাই সরকারকে খুনিচক্রের সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়।

কিন্তু শেখ হাসিনা যখন সরাসরি বেগম খালেদা জিয়ার দিকে আঙুলি তোলেন খুনি হিসেবে, তখন জনগণের মনে হতে থাকে, আচ্ছা এটা তাহলে রাজনীতি? তাদের মনে তখন এই প্রশ্নও জাগে, খালেদা জিয়াকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিলেই কি কিবরিয়া হত্যাকান্ড বা গ্রেনেড হামলার বিচার হবে? তাহলে আওয়ামী লীগের শাসনামলে সংঘটিত রমনার বটমূলে কিংবা যশোরে উদীচীর বোমা হামলার বিচার হলো না কেন? তাহলে কিবরিয়া হত্যাকান্ডের বিচারের জন্য খালেদাকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামাতে হবে কেন?

৫.

সপ্তাহটা ঘুরতে না ঘুরতেই কিবরিয়া হত্যাকান্ডটি এখন ভিন্ন রাজনীতির ইস্যুতে মোড় নিয়েছে। শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলার পর সুশীল সমাজের (!) একদল মুখপাত্র জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়ে হামলাকারীদের আড়াল করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এবারও রাজনীতির নোংরা বিতর্ক খুনিচক্রকে আড়াল হতে সহায়তা দিচ্ছে। এখন কিবরিয়া হত্যাকান্ড, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ- এসবের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে সার্ক সম্মেলন হতে না পারার বেদনা কিংবা সাফল্যের আনন্দ। ক্ষমতাসীন সরকার সত্যিকার অর্থে সভ্য কিংবা বিবেকবান হলে কিবরিয়া হত্যাকান্ডের পরপরই সার্ক সম্মেলন স্থগিত করে দেয়ার উদ্যোগ নিতো। দেশে একজন জাতীয় নেতা খুন হলে তখন যে সে দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে না, এই বোধটা তাদের মধ্যে কাজ করতো। কিন্তু বিবেকবর্জিত অসভ্য সরকার বলেই কিবরিয়ার রক্তাক্ত শবদেহের ওপর আলো ঝলমল উৎসব করার মতো বিকৃত রুচি দেখাতে পেরেছে। আর আওয়ামী লীগও হয়তো ভেবেছে সার্ক সম্মেলন বানচাল করে দেওয়ার মধ্যেই রাজনীতির সাফল্য নিহিত। ফলে কিবরিয়া হত্যার এই সুযোগটা তারা হাতছাড়া করতে চায়নি। প্রশ্ন উঠতে পারে, তিন দিনের হরতাল আর ছয় দিনের হরতালে পরিস্থিতির কি এমন তারতম্য ঘটায়? কিবরিয়া হত্যাকান্ড যখন সমমনা সব রাজনৈতিক দলকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালনের মাধ্যমে কিবরিয়া হত্যাকান্ডকে ধিক্কার দিয়েছে, তখন হরতালকে আরো তিন দিন বাড়িয়ে দেওয়ার যৌক্তিকতা কি? তাও আবার শরিক দলগুলো যখন তাতে সম্মত হচ্ছে না। তিন দিন হরতাল বাড়িয়েই কি আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিতে পেরেছে, নাকি পেরেছে কিবরিয়া হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারে বাধ্য করতে? মাঝখানে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে খুনিচক্রকে আড়াল করার সুযোগ করে দিয়েছে।

কিবরিয়া হত্যাকান্ড যখন সমমনা সব রাজনৈতিক দলকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালনের মাধ্যমে কিবরিয়া হত্যাকান্ডকে ধিক্কার দিয়েছে, তখন হরতালকে আরো তিন দিন বাড়িয়ে দেওয়ার যৌক্তিকতা কি?

সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো যখন সম্মিলিত আন্দোলন থেকে ভিন্নমত পোষণ করে সরে দাঁড়ায়, দেশের ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা যখন আওয়ামী লীগের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তখন সঙ্গত কারণেই সেই আন্দোলন জনগণের কাছেও দুর্বল বিবেচিত হয়।

অনেকেই হয়তো বলবেন, বাংলাদেশের ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা তো বরাবরই সুবিধাভোগী, তারা সরকারের আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করে। এটা তো নতুন কোনো ঘটনা নয়। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সংগঠন, চেম্বারগুলো যতোটা না নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত, তারচেয়ে বেশি পরিচালিত স্বার্থসিদ্ধিবোধ দ্বারা। প্রতি সপ্তাহে দুই দিনের ছুটির নামে সব কর্মযজ্ঞ বন্ধ করে রাখায় এই ব্যবসায়ীদের উৎপাদনের ক্ষতি হয় না, দেশের একজন সাবেক অর্থমন্ত্রী সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিহত হলে তাদের ক্রেতা হাতছাড়া হয় না, সহিংসতার প্রতিবাদে বিরোধী দলের হরতালেই কেবল তাদের সব ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে উঠে যায়। কই, এসব ব্যবসায়ীরা তো শক্ত করে সরকারকে বললেন না, এসব খুন-রাহাজানি বন্ধ করুন, রাজনীতিবিদ তথা দেশের মানুষের নিরাপত্তা দিন, নইলে আন্তর্জাতিক বাজারে আমরা বেকায়দায় পড়ি। আসমা কিবরিয়ার অরাজনৈতিক, অহিংস আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করতে কোনো ব্যবসায়ী নেতা গিয়েছেন বলে তো শোনা যায়নি। খুনের প্রতিবাদ করার মতো নৈতিকতা না থাকলে দেশের ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরাও তো খুনিচক্রের সুবিধা আদায়ের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার দায়ে অভিযুক্ত হবেন।

৬.

নগরে আগুন লাগলে দেবালয়ও অরক্ষিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে বোমা, গ্রেনেড হামলা আর হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকলে সুদূর প্রবাসে বসে আমরাও অরক্ষিত হয়ে পড়ি। দেশের প্রজ্বলিত আগুনের তাপ এসে লাখো প্রবাসীর গায়েও লাগে। প্রবাসীরা আরো চিন্তিত হয়। কারণ বিদেশে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা তারা দেশে পাঠায় এবং তাদের এই পাঠানো মুদ্রা দিয়েই সরকার তার বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির শক্তি দেখিয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে। আমরা যারা সরকারের এই তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলায় সহায়তা দিতে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করি, তারা তো চাইতে পারে, আমাদের জন্মভূমিতে কোনো খুনিচক্রের পদচারণা থাকবে না।

শাহ এএমএস কিবরিয়ার স্ত্রী শিল্পী আসমা কিবরিয়া এবং তার পরিবার খুনিচক্রের বিচারের দাবিতে অরাজনৈতিক এবং অহিংস এক আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। সুদূর প্রবাসে বসে আমরা স্বপ্ন দেখি, একদিন জাহানারা ইমাম যেমন একাত্তরের ঘাতকদের বিরুদ্ধে সারা দেশে এক গণজোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি আসমা কিবরিয়া গ্রেনেডবাজ, বোমাবাজদের বিরুদ্ধে নতুন এক জোয়ার তৈরি করতে সমর্থ হবেন। আমাদের স্বপ্ন দেশের আপামর জনতার সঙ্গে হরতালের বিকল্প আন্দোলনের পরামর্শদাতা সুশীল সমাজ, দেশের ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরাও তাতে শামিল হয়ে তাদের নীতিবোধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণ দেবেন।